৭

এই ইউনিটের সাধারণ শিরোনাম “অবকাঠামো” হলেও এখানে আমরা আমাদের আলোচনা “ভৌত অবকাঠামোর” মধ্যেই রেখেছি। কারণ এই গ্রন্থের সর্বশেষ ইউনিট “বাংণাদেশে মানব উন্নয়ন” অংশে “সামাজিক অবকাঠামো” তথ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তাই এই ইউনিটে পুনরুক্তি এড়ানোর জন্য এসব বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ভৌত অবকাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে ক্রম অনুসরণ করেছি তা টিউটরের উচ্ছানুসারে আগে পরে বদলে আলোচনা করা যেতে পারে কারণ প্রতিটি বিষয়ই এক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পৃথক বিষয় হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। অবশ্য তিনে মিলে ভৌত কাঠামো ইউনিটের গঠন এবং এই ইউনিটের অভ্যন্তরেই এদের অবস্থান।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

□ পাঠ-১. ভৌত অবকাঠামো ঃ শক্তি খাত

□ পাঠ-২. ভৌত অবকাঠামো ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ

□ পাঠ-৩. ভৌত অবকাঠামো ঃ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

পাঠ-৭.১ ঃ ভৌত অবকাঠামো : শক্তি খাত

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অবকাঠামো কি এবং কত প্রকার;
- "অবকাঠামোর" অর্থনৈতিক গরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য;
- ভৌত অবকাঠামোর সঙ্গে সামাজিক অবকাঠামোর পার্থক্য;
- ভৌত অবকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত শক্তি খাত;
- গ্যাস ও বিদ্যুৎ;
- একটি আদর্শ শক্তি/জ্বালানী নীতির চরিত্র।

পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদিত সেবা জনসাধারনের জন্য সাধারনভাবে উন্মুক্তক থাকে অথবা এদের বাহ্যিক উপকার আছে যার জন্য বাজার থেকে কোন দাম বা বিক্রয়মূল্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

অবকাঠামো ঃ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

অর্থনীতিতে "অবকাঠামো" বলতে আমরা সেই সব বস্তুগত ও সামাজিক উপাদানকে বোঝাই যারা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য পণ্য বা পুঁজি দ্রব্য নয় কিন্তু তথাপি যাদের ছাড়া প্রায় কোন উৎপাদন কর্মই বাস্তবায়ন বা/এবং ত্বরান্বিত করা যায় না। এ ধরনের উৎপাদন সহায়ক উপাদান বা অবকাঠামোকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। এই বিস্তৃত বিভাজন নিম্নোক্ত রেখাচিত্রে দেখানো হল:

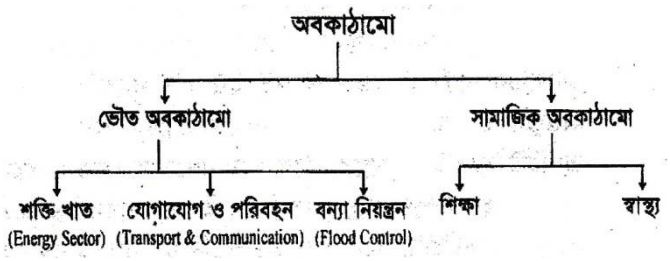

অর্থনীতির উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমান দক্ষ অবকাঠামো সেবার প্রয়োজন অপরিহার্য। "অবকাঠামো সেবার" নিম্নোক্ত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়:

ক. এসব সেবা সরবরাহের জন্য অনেক বেশি পরিমানে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

খ. এসব পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদিত সেবা জনসাধারনের জন্য সাধারনভাবে উন্মুক্ত থাকে অথবা এদের বাহ্যিক (Extemal) উপকার আছে যার জন্য বাজার থেকে কোন দাম বা বিক্রয়মূল্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

গ. "ক" এবং "খ" বৈশিষ্ট্যের জন্য অবকাঠামো সেবার খাতে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী থাকেন না। সুতরাং সরকারকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হয়।

ভৌত অবকাঠামো : শক্তি খাত

শক্তির প্রধান রূপ হচ্ছে "জ্বালানী দ্রব্য" বাংলাদেশে এই শক্তি বা "জ্বালানীর" উৎস প্রধানত: দুই রকম।

১. ট্রাডিশনাল বা চিরায়ত উৎস : এর অধীনে যে সব জ্বালানী রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- গোবর বা ঘুটে, বনের কাঠ/গাছ-গাছালি, খড়, পাট কাঠি ইত্যাদি। এই জ্বালানীগুলো প্রধানত: গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করে থাকেন এবং এগুলোর ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকেই হচ্ছে। তদুপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে সংগ্রহ করে থাকেন অথবা নিজেরাই উৎপাদন করেন।

২. বাণিজ্যিক উৎস: বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভাবে বাজারজাত এবং ক্রয় করে ব্যবহার করতে হয় এরকম জ্বালানীগুলো হচ্ছে: প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, ডিজেল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। এছাড়াও আরেকটি বড় বাণিজ্যিক শক্তি উৎস হচ্ছে বিদ্যুত। তবে বিদ্যুত শক্তি আমাদের দেশে অংশত পানি, অংশত গ্যাস ও খনিজ তৈল এর থেকেই তৈরী ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সম্ভাবনাময় শক্তি উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

আমাদের দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সম্ভবনাময় শক্তি উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রাকৃতিক গ্যাস

অর্থবছর ২০১৮ সালের জন্য প্রকাশিত সরকারী দলিল অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে এ যাবৎ আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি। এ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমান (২০১৮ সালের ক্রমপুঞ্জিতে পরিমান) হচ্ছে ১৫.৭০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং নীট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাস রয়েছে ১২.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট প্রাথমিক গ্যাস মজুদ ৩৯.৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার মধ্যে, ২৭.৮১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রামানিত এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারযোগ্য।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সর্বসাকূল্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গ্যাস মজুতের পরিমান ভবিষ্যতে ২২.৭৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুটে দাঁড়াতে পারে।

২০১৭-১৮ সালের প্রেট্রোবাংলার গিসাব থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে গ্যাস অভ্যন্তরীণ যাতে ব্যবহৃত হয়েছে ৪৯৮.৮ বিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস ব্যবহারের কাঠামো ছিল

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদনে = ৪০.৭৮ শতাংশ।

খ. শিল্প বাণিজ্যের অন্যান্য খাতে = ১৭.৫%

গ. ক্যাপটিভ শক্তি = ১৬.২৬%

ঘ. গৃহস্থালীর জন্য = ১৫.৭৫%

ঙ. সার উৎপাদনে = ৫.০২%

চ. সি এন জি = ৪.৬৮%

বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন যে অভ্যন্তরীন এসব ব্যবহার মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের চাহিদা ছিল ৬০৭ বিলিয়ন ঘনফুট যা বেড়ে ৭০৯ বিলিয়ন ঘনফুট হবে ২০২১-২২ সালে। বর্তমানে শিল্পখাতে গ্যাসের চাহিদা ১৯১ বিলিয়ন ঘটফুটে স্থির থাকলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে তা হবে ৩৯০ বিলিয়ন ঘনফুট। গৃহস্থালী কাজে এই চাহিদা ২০২১-২২ সালে প্রাক্কলিত হয়েছে ১৩৩ বিলিয়ন ঘনফুট।

চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান মেটাতে ও ভবিষ্যতের শক্তির বৃদ্ধি যোগাতে সরকার এলএনজি আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস দুটি:

ক. জল বিদ্যুৎ: কাপ্তাই লেকের স্রোতকে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র শতাংশ জল বিদ্যুৎ থেকে আসে।

খ. তাপ শক্তি তথ্য গ্যাস ও ডিজেল, ফারনেস তেল ও ন্যাপথা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। মোট উৎপাদিত বিদ্যুদের শতাংশ গ্যাসজাত এবং বাকী ৩৫ শতাংশ ডিজেল ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত হয়।

১৯৯৮-৯৯ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ১৪,৪৫০ মি.কিলোওয়াট পাওয়ারের। সুতরাং হিসাবানুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু বিতরণ হয়নি বা বিতরণ হলেও তার কোন দাম আদায় হয় নি। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ এই ৩৫ শতাংশ উৎপাদিত বিদ্যুৎকে "সিস্টেম লস" হিসাবে অভিহিত করে থাকেন।

১৯৯৮-৯৯ সালে (অর্থনৈতিক জরিপ: ২০০০" সালে উদ্বৃত্ত তথ্যানুযায়ী) দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৬০৩ মেগাওয়াট। ১৯৯৮-৯৯ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ১৪,৪৫০ মি.কিলোওয়াট পাওয়ারের। সুতরাং হিসাবানুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু বিতরণ হয়নি বা বিতরণ হলেও তার কোন দাম আদায় হয় নি। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ এই ৩৫ শতাংশ উৎপাদিত বিদ্যুৎকে "সিস্টেম লস" হিসাবে অভিহিত করে থাকেন।

কিন্তু এই ৩৫ শতাংশ "সিস্টেম লস" আসলে তিন ধরনের লসের সমন্বয়ে গঠিত-

ক. অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বা চুরি।

খ. বৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কর্তৃক মিটার পরিমাপের সময় কমিয়ে পরিমাপ করার প্রবনতা।

গ. টেকনিকেল ত্রুটির জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে অপচয় হয় তা।

তবে এই ৩৫ শতাংশ লসের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই অর্থাৎ বেশিরভাগটাই আসলে "ক" এবং "খ" কারণে হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনকে ও বিতরণ ব্যবস্থাকে দুর্ণীতিমুক্ত করার জন্য বিদ্যুৎ বিতরনের ব্যবস্থায় নানা সংস্কার সাধন করা হয়।

বর্তমানে ৬টি সরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। এগুলো হল

১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

২। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

৩। ঢাকা পাওয়ার ডিস্টিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।

৪। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড।

৫। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।

৬। নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড।

২০০৯-১০ সালে পরিমাপকৃত সিস্টেম লস ছিল শতকরা ১৫.৭৩ ভাগ। ২০১৭-১৮ তে এসে তা হয় ১১.৮৭ শতাংশ।

আদর্শ জ্বালানী নীতি

বাংলাদেশের জন্য একটি "আদর্শ জ্বালানী নীতি বা শক্তি নীতি" প্রনয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে ও যে বিষয়গুলো বিবেচনার জন শ্য জরুরীভাবে সম্মুখে উপস্থিত করেন তা হচ্ছে: শতাংশ ডিজেল ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত হয়।

ক. ট্রাডিশনাল বা চিরায়ত জ্বালানী উৎস যাতে যথেচ্ছা কমিয়ে দিয়ে পুরো চাপ "গ্যাস ও বিদ্যুৎ" খাতের উপর এসে না পড়ে এজন্য নিম্নোক্ত পরিকল্পিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে: পশুসম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, সামাজিক বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বায়োগ্যাস, সৌর-শক্তি ইত্যাদির ব্যবহার চালু করতে হবে।

খ. কয়লা খনি, পেট্রোলিয়াম ও নতুন নুতন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

গ. প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সতর্ক নীতি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

ঘ. "সিস্টেম লস" কমানোর জন্য ব্যক্তিখাত-রাষ্ট্রীয় খাত নির্বিশেষে সুশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

অবকাঠামো দুই প্রকার: ভৌত ও সামাজিক। ভৌত অবকাঠামো অর্ন্তগত উপাদানগুলো হচ্ছে শক্তি খাত, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সামাজিক অবকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত উপাদানগুলো হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। অবকাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাহায্যকারী উপাদান। কিন্তু এর জন্য বিপুল ব্যয় ও বিনিয়োগ প্রয়োজন অথচ এর থেকে তেমন কোন ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। এই কারণে এই বিষয়ে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। তাই অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার মুখ্য ভূমিকা রাখেন। ভৌত অবকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত শক্তি খাতে আমাদের প্রধান দুটি উপখাত হচ্ছে গ্যাস ও বিদ্যুৎ। যেহেতু আমাদের দেশে সম্ভাব্য গ্যাস মজুত সীমিত সেহেতু গ্যাস বাইরে রপ্তানি করার ব্যাপারে বা বিদেশীদের সঙ্গে গ্যাস উত্তোলন চুক্তি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাদের রয়ে-সয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমাদের অপর একটি শক্তির উৎন বিদ্যুৎ ও তেল/কয়লা পুড়িয়ে সামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা সিষ্টেম লস। ২০১৭-১৮ সালে সিস্টেম লসের হার ছিল ১১.৮৭ শতাংশ। বর্তমানে সবদিকে বিবেচনা করে আমাদের একটি আদর্শ জ্বালানী নীতি প্রনয়ন করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. অবকাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থার একটি-

ক. সহায়ক উপাদান;

খ. প্রত্যকক্ষ উৎপাদনের অবদান;

গ. অত্যাবশ্যকীয় সহায়ক উপাদান।

২. অবকাঠামো প্রধানত-

ক. তিন রকম; খ. চার রকম; গ.দুই রকম।

৩. ভৌত অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হচ্ছে-

ক. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বন্যা নিয়ন্ত্রন;

খ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস;

গ. বিদ্যুৎ, গ্যাস, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও যোগাযোগ এবং পরিবহন।

৪. ২০০০ সালে বাংলাদেশে সম্ভাব্য উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমান হচ্ছে-

ক. প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; খ. প্রায় ২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; গ. প্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

৫. বাংলাদেশের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুত (অভ্যন্তরীন ব্যবহারের বর্তমান ক্রমবর্ধমান প্রক্ষেপনের ভিত্তিতে) অনুমিত যে বছরে নি:শেষ হয়ে যাবে তা হচ্ছে-

ক. ২০১০ সাল; খ. ২০২১ সাল; গ. ২০১৫ সাল;

৬. বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস হচ্ছে-

ক. খনিজ তেল; খ. পানি; গ. গ্যাস।

২. ১৯৭৮-৯৯ সালে উৎপাদনের প্রধান উৎস হচ্ছে-

ক. খনিজ তেল; খ. পানি; গ. ৩০ শতাংশ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে গ্যাস মজুদের সম্ভাব্য পরিমান কত?

২. বিদ্যুতের "সিস্টেম লস" কি এবং কেন তা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের জন্য একটি "জ্বালানী নীতির" সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন?

২. বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি করার প্রশ্নে আপনার নিজস্ব মতামত কি? এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

পাঠ-৭.২ ঃ ভৌত অবকাঠামো : বন্যা নিয়ন্ত্রণ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশে কয় ধরনের বন্যা হয়;
- বাংলাদেশের ভয়াবহতা এবং ক্ষতিগুলো;
- বন্যার সঙ্গে মিলিয়ে ফসল-বিন্যাসের পরিবর্তন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রনের সম্ভাব্য কৌশলগুলো।

বন্যার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বন্যা প্রধানত: দু-রকমের;

ক. আকস্মিক ও ক্ষনস্থায়ী বন্যা; খ. মৌসুমী দীর্ঘস্থায়ী বন্যা

সচরাচর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সিলেট ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে সংঘটিত হয় বলে দীর্ঘদিন কোথাও পানি জমে থাকে না। এই বন্যার ফলে ক্ষতি তীব্র হয় কিন্তু তা দ্রুত ও স্বল্পস্থায়ী হয়। আগে থেকে খুব একটা সতর্ক হওয়ার সুযোগ এ ধরনের বন্যার ক্ষেত্রে নেই।

পক্ষান্তরে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পানি বাড়তে থাকে। যে বছর এই স্বাভাবিক পানি বৃদ্ধির (গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের বরফ গলার ফলেই তা হয়) সঙ্গে মৌসুমী অবিরাম বৃষ্টি যুক্ত হয় সে বছর নদীর দুই কূল উপচে আশে পাশের নিম্নাঞ্চলে প্লাবিত হয়ে যায়। এ ধরনের বন্যাকে বর্ষাকলের স্বাভাবিক বন্যা হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং তা কোন নিম্নাঞ্চলে বাধ দিয়ে বন্যার পানি আটকানোর চেষ্টা হলে, যেখানে বাধের ভেতরে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতা বা আংশিক বন্যার সৃষ্টি হতে পারে।

বন্যার মাত্রা ও ভয়াবহতা

বাংলাদেশ উত্তর থেকে দক্ষিণে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে। এই কারণে বাংলাদেশের প্রধান বৃহৎ নদীগুলো পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, সবগুলোরই উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের বাইরে ভারতে এবং নেপালে। সুতরাং উর্ধ্বাঞ্চল থেকে বাংলাদেশে প্রতিবছর বর্ষাকালে এসব নদী প্রায় ৫ মিলিয়ন কিউসেফ পানি এবং ২.৪ বিলিয়ন টন পলি প্রবাহ নিয়ে আসছে। গড়ে প্রতি বছর দেশের প্রায় ১৮ শতাংশ অঞ্চলকে প্লাবিত করে থাকে। ইদানিং পলি-প্রবাহের ফলে নদীর গর্ভে পানি জমার পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া নদীর নাব্যতা হ্রাস, বিভিন্ন স্থানে মানুষের বাসস্থান নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, আবাদ প্রক্রিয়া, আবর্জনা নিস্কাশন ইত্যাদির ফলে নদীর পানি নানা জায়গায় বন্যার সৃষ্টি করেছে। কোন কোন সময়ে এই বণ্যায় প্রকোপ সমগ্র বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

পলি-প্রবাহের ফলে নদীর গর্ভে পানি জমার পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া নদীর নাব্যতা হ্রাস, বিভিন্ন স্থানে মানুষের বাসস্থান নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, আবাদ প্রক্রিয়া, আবর্জনা নিস্কাশন ইত্যাদি ফলে নদীর পানি নানা জায়গায় বণ্যার সৃষ্টি করে।

ইদানিং সমুদ্র উপকূলে লবণাক্ত পানিও প্লাবনের সৃষ্টি করেছে। বিশেষত: বেশি জোয়ারের সময় উপকূল এলাকায় প্রায় ১-২মি. হেক্টর জমি নিয়মিতভাবে লবণাক্ততার শিকার হয়।

স্বাধীনতার পর এ যাবৎ বাংলাদেশে চারটি বিশেষ ধরনের ভয়াবহ বন্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো

হচ্ছে ১৯৭৪ এর বন্যা, ১৯৮৪ সালের বন্যা এবং ১৯৯৮ সালের বন্যা। এসব বন্যায় প্রধানত: ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গ্রামের চাষীরা এবং তাদের ক্ষেতের ফসল। ১৯৭৪ এবং ১৯৮৪ সালে ক্ষতিগ্রস্ত চাল উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ২৮ লক্ষ টন। যেহেতু বন্যা কম বেশি নিয়মিত ভাবেই বাংলাদেশে হয় সেহেতু চাষীরা বর্তমানে বন্যায় সঙ্গেই মিলিয়ে তাদের ফসল বিন্যাস নির্ধারন করেছেন। যে সব এলাকায় বন্যা বেশি গভীর নয় অর্থাৎ যে সব এলাকার জমি ৯০ থেকে ১৮০ সে.মি. পানির তলে ডুবে থাকে সে সব এলাকায় মার্চ মাসেই চাষীরা "গভীর পানির" ধান গাছ বপন করেন যা পানি বাড়ার সংগে বাড়তে থাকে এবং পানি নেমে গেলে নভেম্বর মাসে এর ফসল ঘরে ওঠানো হয়। প্রায় ১৬ শতাংশ জমি এ ধরনের বন্যায় আক্রান্ত হয়। আরো ১২ শতাংশ জমি রয়েছে যেখানে বন্যার ফলে জমি ১৮০ সে.মি. এর চেয়েও গভীর পানিতে ডুবে যায়। এ ধরনের ১২ শতাংশ জমি সাধারনত: বর্ষা কালে অনাবাদী ফেলে রাখা হয়। পরে শীত কালে এসব পলি সমৃদ্ধ জমিতে বেশ ভালই ফসল ফলে। বস্তুত: বন্যাক্রান্ত জমিতে চাষীরা স্বাভাবিক ভাবেই বেশি বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে আগ্রহী থাকেন না এবং শীত মৌসুমের বাইরে এসব জমিতে সচরাচর কোন উফশী ধানের আবাদ হয় না। ধান উৎপাদনের ক্ষতি ছাড়াও, বন্যার মাত্রা খুব বেড়ে গেলে গবাদি পশু, বাড়ী-ঘর এবং এমনকি প্রচুর প্রানহানিও ঘটে থাকে। বন্যা, পরবর্তীতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে এবং কাজের অভাব দেখা দিলে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারগুলোর জীবন প্রায়ই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

বন্যা পরবর্তীতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে এবং কাজের অভাব দেখা দিলে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারগুলোর জীবন প্রায়ই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

বন্যা সমস্যার সমাধান

বন্যা সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা। যেহেতু বাংলাদেশে বন্যার কারণ নদী বাহিত পানি এবং নদীগুলোর উৎস হয় ভারতে না হয় নেপালে সেহেতু ভারত ও নেপালের সঙ্গে মিলে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু নদীর উর্ধ্বাঞ্চলে অবস্থিত (Uppen Riperian Region) দেশের স্বার্থ সর্বদা নিম্নাঞ্চলের জনগেণর স্বার্থের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু এর পরেও আর্ন্তজাতিক আইনের সাহায্যে এবং ত্রিপক্ষীয় পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ষাকালে "জলাধার নির্মাণ করে" জল শুল্ক মওসুমের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। তবে "জল সংরক্ষণ" করে যে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করা হবে সে জন্য যে বিপুল বিনিয়োগ দরকার তার ব্যয় ভার কারা কতটুকু গ্রহণ করবে এ নিয়ে অজস্র খুটি-নাটি বিতর্ক ও সমস্যা থাকাই স্বাভাবিক। তাই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠা পর্যন্ত এই সমস্যার আন্তর্জাতিক স্থায়ী মীমাংসা সুদুর পরাহতই থেকে যাবে বলে মনে হয়।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠা পর্যন্ত বন্যা সমস্যার আন্তর্জাতিক স্থায়ী মীমাংসা সুদুর পরাহতই থেকে যাবে বলে মনে হয়।

তবে আপাতত: বন্যা সমস্যা সমাধানের মূল দায়িত্ব বাংলাদেশে "পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের" কাঁধে বর্তিয়েছে। পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মূলত: তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে বন্যা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে থাকেন-

ক. খাল নর্দমা খনন করে পানিকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহমান রাখা।

খ. নদী ও শাখা নদীগুলোর ভূগর্ভ খননের মাধ্যমে গভীরতম করা, এবং

গ. বাঁধ নির্মাণ।

ইদানিং "বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রনের" কৌশলটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বেশ সমালোচিত হচ্ছে। তাদের আপত্তিগুলো প্রধানত: নিম্নরূপ-

ক. বাঁধ নির্মাণ করলে এক অঞ্চলে বন্যার পানি ঢুকতে পারে না ঠিকই কিন্তু অন্য অঞ্চলে বন্যার পানি বেশি হারে ঢুকে যায়। ফলে বাঁধ নির্মাণ বন্যাকে স্থানান্তরিত করে মাত্র, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

খ. বাঁধ ঠিক মত রক্ষনাবেক্ষন না হলে কোন না কোন সময় ভেঙ্গে পড়ে এবং তখন ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

গ. বাঁধের ভেতরে বৃষ্টির পানি জমে থাকে এবং জলাবদ্ধতার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ঘ. "পানি প্রবাহ" আমাদের মত নদী মাতৃক দেশে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একে নিয়ন্ত্রনের বদলে এর সঙ্গে মিলে মিলে বসবাসের নীতিই সঠিক। তাতে পরিবেশের অবনতি কম হবে, মাছ উৎপাদন ও জল-পথে যোগাযোগ ত্বরান্বিত হবে।

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশে বন্যা প্রধানত: দু-ধরনের ক্ষনস্থায়ী আকস্মিক বন্যা এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মৌসুমী বন্যা। এছাড়া উপকূল এলাকায় লবনাক্ত পানি এবং নিম্নাঞ্চলে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতার সমস্যাও সৃষ্টি হয়। বন্যার প্রধান ক্ষতি হচ্ছে ফসল হানি। ১৯৭৪, ১৯৮৮,১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল বাংলাদেশের জন্য বিশেষ ভাবে ভয়াবহ। বন্যা সমস্যার মৌলিক সমাধানের জন্যে প্রয়োজন ভারত-নেপাল-বাংলাদেশের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা ও বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ। এ ছাড়া আপাতত: খাল ও নর্দমা খনন, নদী খনন এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইদানিং বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন যে বাঁধ নির্মাণ করে কৃত্রিম ভাবে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের চেয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে জীবনযাপন করতে পারলে তা পরিবেশের জন্য অধিকতর কাম্য ফলাফল সৃষ্টি করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশে বন্যা প্রধানত-

ক. তিন প্রকার; খ. চার প্রকার;

গ. দুই প্রকার।

২. বাংলাদেশে ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয়-

ক. পাহাড়ি চলের কারণে; খ. নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে;

গ. উপকূলীয় জোয়ারের কারণে।

৩. বাংলাদেশে মৌসুমী বন্যা সাধারনত; হয়-

ক. জুলাই মাসে;

খ. আগস্ট মাসে;

গ. আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

৪. বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্লাবিত হয়-

ক. ১৮ থেকে ৩৬ শতাংশ এলাকা; খ. ১০ থেকে ১৮ শতাংশ এলাকা;

গ. ৫ থেকে ১০ শতাংশ এলাকা।

৫. বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে-

ক. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা; খ. দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ;

গ. কারিগরী জ্ঞান;

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রনের এ যাবৎকাল অনুসৃত কৌশলগুলো কি? এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন লিখুন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশে বন্যার প্রকারভেদ কি?

পাঠ-৭.৩ ঃ ভৌত অবকাঠামো : পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা কয় ভাগে বিভক্ত;
- সমগ্র অর্থনীতিতে পরিবহন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক অবদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটুকু;
- পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে যে তিন প্রকার উপাদান রয়েছে তার কোনটির অবদান কতটুকু;
- বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক জন্মকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ কি ছিল;
- সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন এবং রেল ও বিমান পরিবহন;
- টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ডাক মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট ইত্যাদি অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ
বাংলাদেশ প্রধানত: তিন রকম পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান;
ক. স্থল পথ বা সড়ক পরিবহন এবং রেল।
খ. জল পথ বা নৌ-পরিবহন।
গ. আকাশ পথ বা বিমান পরিবহন।

বাংলাদেশের "যোগাযোগ ব্যবস্থার" মধ্যে অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ডাক বিভাগ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ এবং সাম্প্রতিক কালে যুক্ত হয়েছে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে বা কম্পিউটার নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক অবদান:
সড়ক পরিবহন, নৌ-পরিবহন ও বেসামরিক বিমান পরিবহনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশী যাত্রী ও মালপত্র আসা-যাওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবহন সেবা বাবদ যে মূল্য সৃষ্টি হয়, অর্থনীতিবিদরা তার পরিমাপ করেছেন।

বাংলাদেশে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে জি.ডি.পি-র প্রায় ১১ শতাংশ মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে অর্থনীতিবিদরা পরিমাপ করেছেন (২০১৮ সালের হিসাবে) এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫৮ শতাংশ। জি. ডি. পি এর ১১ শতাংশ মূল্যের ৬৩ শতাংশ এসেছে জলপথ এবং ১ শতাংশ এসেছে আকাশ পথ থেকে। একটি উন্নত ও দক্ষ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা খুব প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এবং আরো কিছু মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সীমিত সম্পদ নিয়েই বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিমিটেড বিভিন্ন রুটে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১২ই মে, প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" মহাকাশে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ভিশন -২০২১, এসডিজি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকার তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

> বাংলাদেশে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে জি.ডি.পি-র প্রায় ১১ শতাংশ মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে অর্থনীতিবিদরা পরিমাপ করেছেন (২০১৮ সালের হিসাবে) এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫৮ শতাংশ।

নৌ-পরিবহন থেকে এবং ৩ শতাংশ মূল্য এসেছে রেল, বেসামরিক পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে। বস্তুত: ১৯৮৫ সালের হিসাবে দেখা গিয়েছিল যে মোট মাল পরিবহনের ৫৪ শতাংশ পরিবাহিত হয়েছিল সড়ক পথে। ৩০ শতাংশ নৌপথে পরিবাহিত হয়েছিল এবং বাকী ১৬ শতাংশ

মাল রেল পথে পরিবাহিত হয়েছিল। আর যাত্রীদের মধ্যে ৫১ শতাংশ যাত্রী সড়ক পথে, ২৮ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ রেল পথে গমনকালে করেছিলেন। সুতরাং মালপত্র ও যাত্রী পরিবহণের উপরোক্ত বিন্যাস ও জি.ডি.পি-তে অর্থনৈতিক অবদান মাত্রা উভয় নিরিখেই বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে সড়ক-পরিবহনকে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ ক্রমানুযায়ী বাংলাদেশের পরিবহনের মাধ্যমগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-সড়ক, জলপথ এবং রেল পথ। বাংলাদেশে বিমান পথের গুরুত্ব এখন পর্যন্ত নগণ্য ও ব্যয়বহুল। যদিও আমাদের কাছে ১৯৮৫ পরবর্তী তথ্য নেই তবু ধারণা করা যায় যে এই ধারা এখনো অব্যাহতই আছে।

পরিবহন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য:

বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক ব্যবস্থা, রেল যোগাযোগ এবং নৌপথগুলোর উদ্ভব হয়েছে বৃটিশ আমলে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ শাসনকদের স্বাথেই এই যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো প্রাথমিক ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্বার্থ ছিল দূর-দূরান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ব্রিটেনে রপ্তানি করা এবং ব্রিটেন থেকে পন্য আমদানি করে উপনিবেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা বাজার জাত করা, সেহেতু এ সময়ে গড়ে তোলা যোগাযোগ ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল "কলকাতা" বন্দর।

তাই স্বাভাবিক ভাবেই অবিভক্ত বাংলার প্রথম রেলপথ, সড়ক পথ এবং নৌপথগুলো নির্মিত হয়েছিল কলকাতার সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের পশ্চাৎপদ এলাকাগুলো, সিলেটের চা বাগান এলাকাগুলো এবং আসনসোলের কয়লাখনি এলাকার যোগাযোগ সাধনের সাধনের নিমিত্তে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ দীর্ঘ সড়কগুলো উত্তর-দক্ষিন বিস্তৃত। এই গতিমুখের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের নদীগুলোর উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখীনতা।

পাকিস্তান আমলে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে, রেল ব্যবস্থায় কোন মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয় নি। খালি সড়ক ব্যবস্থায় কতিপয় নতুন ঢাকা-কেন্দ্রিক সংযোগ সড়ক গড়ে তোলা ঞয়। সাধারণভাবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ দীর্ঘ সড়কগুলো উত্তর-দক্ষিন বিস্তৃত। এই গতিমুখের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের নদীগুলোর উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখীনতা। এই কারণেই পূর্ব-পশ্চিম সড়ক নির্মাণ করতে হলে অল্প ব্যবধান পর পরই সেতু নির্মাণ প্রয়োজন হতো এবং তা নি:সন্দেহে ছিল ব্যয় বহুল। বস্তুত: স্বাধীনতার পরেও সেতু নির্মাণ প্রয়োজন হতো এবং তা নি:সন্দেহে ছিল ব্যয় বহুল। বস্তুত: স্বাধীনতার পরেও সুদীর্ঘ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে পূর্ব-পশ্চিম যোগাযোগ সাধনকারী একটানা সড়ক ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৯৫ এর পর যমুনা সেতু নির্মানের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এর ফলে শুধু যে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ শক্তিশালী হয়েছে তাই নয়, গ্যাস ও বিদ্যুতের যোগাযোগও ত্বরান্বিত হয়েছে।

সাধারণত: সরকার জোর দেন শহর ও উপজেলাগুলোকে বড় বড় হাই-ওয়ের সঙ্গে যুক্তকারী সড়কের উপর। এসবের পাশাপাশি গ্রামে ও মহল্লায় হাট-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগকারী "ফীডার" রাস্তাগুলো সচরাচর অবহেলিত থেকে যায়।

সড়ক ব্যবস্থা

সড়ক ব্যবস্থাকে মাপা হয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য দ্বারা। সেই হিসাবে দেখা যায় যে ষাটের দশকে "Paved Road" বা খোয়া বিছানো রাস্তার দৈর্ঘ্য ১০ বছরে দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অবশ্য সড়ক পরিবহনে অগ্রগতি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আনুমানিক প্রায় ৩০০টি সেতু সে সময় মুক্তিযুদ্ধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই সত্তর দশক ছিল মূলত: পুরোনো সড়ক ব্যবস্থারই পুনর্বাসনের দশক। এই দশ বছরে রাস্তার নীট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ১৫৬ মাইল। অবশ্য আশির দশকে সামরিক সরকার জেনারেল এরশাদের আমলে নতুন সড়ক সৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমানে। এসময় নীট সড়ক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ১৩৬০ মাইল। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ১৫ বছরে গড়ে বাংলাদেশে সড়ক দৈর্ঘ্য প্রতি বছর ৩.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৮০-৮৬ সালে বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ। ঐ ছয় বছরে গড় বৃদ্ধির হার ছিল ১০

শতাংশ। বাংলাদেশে সড়ক দৈর্ঘ্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সমগ্র এশিয়াতে ১৯৮৭ সালে গড়ে ১০০ বর্গ মাইল এলাকায় ধাতব রাস্তার পরিমান ছিল ১০.৫ মাইল। বাংলাদেশে ১৯৮৭ সালে ছিল মাত্র ৭ মাইল। তবে বাংলাদেশে শুধু সড়কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলেই চলবে না। তা বৃদ্ধি করতে হবে ভারসাম্য পূর্ণ ভাবে ভারসাম্য পূর্ণ ভাবে। সাধারনত: সরকার জোর দেন শহর ও উপজেলাগুলোকে বড় বড় হাই ওয়েব সঙ্গে যুক্তকারী সড়কের উপর। এসবের পাশাপাশি গ্রামে ও মহল্লায় হাট-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগকারী "ফীডার" রাস্তাগুলো সচরাচর অবহেলিত থেকে যায়। ১৯৮৬ সালের হিসাবানুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের খোয়া-বিছানো রাস্তার মোট দৈর্ঘ্যের -

সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর ব্যবস্থাপনায় দেশের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৩২৩৬.৫ মাইল যার মধ্যে ১১৩১০ মাইল হচ্ছে খোয়া বিছানো রাস্তা। এই বিভাগের অধীনে মোট সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে

- ২৩৬৯ বা ১৭.৯০% জাতীয় মহাসড়ক
- ২৬৩৯ বা ১৯.৯৪% আঞ্চলিক মহাসড়ক
- অবশিষ্ট ৮২২৮ বা ৬২.১৬% জেলা সড়ক

এছাড়াও আরএইচডি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৪,৪০৪টি ব্রিজ এবং ১৪,৮১৪টি কালভার্ট রয়েছে। তদুপরি, আরএইচডি বর্তমানে সারা দেশে তার রোড নেটওয়ার্কে ৪১টি ফেরি ঘাটে প্রায় ৯৬টি ফেরি নৌকা চালাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছর ধরে আরএইচডি এর অধীনে রোড নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বাড়েনি। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের উন্নয়ন/উন্নয়নের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বিভাগের মান উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের পরিবহন খাতের আরেকটি জটিল সমস্যা হচ্ছে মাল পরিবহনের বৈষম্য। বিশেষত: শহর থেকে মাল যখন গ্রামাঞ্চলে বা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত কেন্দ্রগুলোতে যায় তখন তা মূলত; ট্রাক ও অন্যান্য ভারী যানবাহনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। কিন্তু গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলগুলো থেকে এসব গড়ে বৃদ্ধি পেয়ে যেতে বাধ্য। গ্রাম্যঞ্চলে হাটের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ রক্ষাকারী পরিবহন "গরুর গাড়ির" ক্ষেত্রেও এটা আংশিকভাবে খাটে।

নৌ-পরিবহন

বাংলাদেশের নৌ-পরিবহনের চরিত্র মূলত: আঞ্চলিক এবং দক্ষিনাঞ্চলেই এর গুরুত্ব বেশি। বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও খুলনার সঙ্গে নিয়মিত নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ এসব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত এবং নদী বহুল বলে এখানে সড়ক ও রেল যোগাযোগ এখানে কঠিন ও ব্যয়বহুল। তবে বর্তমানে সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সংহত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য মাওয়া-জাঞ্জিরা পয়েন্ট পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেখিয়েছে। ৩০,১৯৩,৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বৃহত্তম প্রকল্পের বাস্তবায়নরে কাজ যা নিজস্ব অর্থায়নের দিক থেকেও বৃহত্তম। প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৫৬.৫০ শতাংশ। পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ১৯টি জেলার সাথে দেশের পূর্বাংশ এবং রাজধানী ঢাকার সংযোগ সাধন করবে।

বাংলাদেশে নৌ-যোগাযোগ আরো সহজসাধ্য হতো যদি নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত নদী-খননের ব্যবস্থা থাকতো।

বাংলাদেশে মোট নৌপথের দৈর্ঘ্য ১৪৯১৩ মাইল হলেও নৌপরিবহনযোগ্য নৌপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৭০৮ মাইল তাও সেটি আবার শুষ্ক মৌসুমে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৪০১.৬ মাইল এ। নৌপথের সম্ভাব্য ন্যূনতম গভীরতম (Least available depth LAD) উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীন নৌচলাচল গতিপথকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: ক্লাস ২, ক্লাস ৩ এবং ক্লাস ৪, যাদের সম্ভাব্য ন্যূনতম গভীরতা যথাক্রমে ৩.৬৬ মিটার, ২-১৩ মিটার, ১.৫২ মিটার এবং ১.৫২ মিটারের

কম। এই চার ধরনের নৌপথের মধ্যে একমাত্র ক্লাস ৪ নৌপথগুলি মূলত মৌসুমী, বাকী নৌপথগুলি সারা বছর ধরে চালু থাকে। ১৯৭২ সালে 'বাংলার দূত' ও ১৯৭৩ সালে 'বাংলার সম্পদ' অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এ যাবৎ সর্বমোট ৩৮ টি জাহাজ সংগ্রহ করে। বয়সজনিত কারণে এবং বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি জাহাজ বিক্রয়/হস্তান্তর করার পর বর্তমানে বিএসসি'র বহরে ০২টি লাইটারেজ ট্যাংকের রয়েছে। বাংলাদেশের ২টি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা বন্দর। এছাড়া ২০১৩ সালে বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর উদ্বোধন করা হয়। পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যকলাপ চালু হয় জাহাজ থেকে জাহাজে মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে ২০১৬ সালে। জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২.২১ লাখ মেট্রিক টন কার্গো পায়রা বন্দরের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়েছে।

রেল ও বিমান পথ

২০১৯ সালের হিসাবে রেলওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ২৯৫৫.৫৩ কি.মি। সারাদেশে চলাচল করা যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা ৩৫২ টি এর মধ্যে আন্ত:নগর ট্রেন ৯০টি, লোকাল ১২৬টি।

২০০৯ সাল থেকে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুনভাবে ৩৩০.১৫ কি.মি রেললাইন, ৯১টি স্টেশন ভবন, ২৯৫টি সেতু এবং ২৪৮.৫০ কিলোমিটার রেলপথ কে ডুয়েলগেজ ট্যাঙ্ক এ রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া পুনর্বাসন করা হয়েছে, ১,৩৩৫.২৩ কিলোমিটার রেলপথ, ৬৪৪ টি সেতু, ১৭৭টি স্টেশন ভবন, ৪৩০টি যাত্রীকোচ ও ২৭৭ টি ওয়াগন। রোলিং স্টকের ঘাটতি মেটাতে ২০ এমজি (MG), ১৬৫ বিজি (BG) এবং ৮১ এমজি ট্যাঙ্ক ওয়াগন, ২৭০টি প্ল্যাট ওয়াগন ৩০ টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা (ICAO) এর একটি সদস্য দেশ সিভিল এভিয়েশন অথারিটি অব বাংলাদেশ (CAAB) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে সিএএবি ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৭টি দেশীয় বিমানবন্দর এবং ২টি শর্ট টেক-অফ এবং ল্যান্ডিং (SRL) বন্দর পরিচালনা করে। জাতীয় পতাকা বাহক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড সীমিত বহন ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার পরেও তার নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বর্তমানে বিমান ৭টি দেশীয় ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এর মধ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলির ২টি গন্তব্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৪টি গন্তব্যে, মধ্য প্রাচ্যের ৮টি গন্তব্যে এবং ইউরোপের ১টি গন্তব্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বর্তমানে থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেলুলার মোবাইল ফোন, পল্লী টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি সেবা বেসরকারী উদ্যোগে প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মূল্য সংযোজিত সেবা হিসাবে ইন্টারনেট, ই-মেইল ও ভি-সেট সার্ভিসও বেসরকারী উদ্যোগে চালু হয়েছে।

অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য বিটিসিএল বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিটিসিএল-এ অর্থবছর ২০১৭-১৮ শেষে ১৫.১৪ ল্যান্ডলাইন ক্ষমতা এবং ৬.১৬ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ ছিল। বিটিসিএল সমস্ত ৬৪টি জেলা, ৪৭১টি উপজেলা এবং ১২১২টি ইউনিয়ন পরিষদ কে ২৩,৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করেছে, যা দেশের প্রধান আইসিটির মেরুদন্ড।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ২০০২ সাল থেকে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটির অবকাঠামোগত সুবিধা দেশের জনসাধারণের কাছে সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে (ফোরজি) মোবাইল

প্রযুক্তি তে প্রবেশ করে। বর্তমানে টেলিফোন ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বিশেষকরে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা পূর্বাভাষ ছারিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাবনুসারে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট গ্রাহকের সংখ্যা ১৫.০৭২ কোটিতে ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" মহাশূণ্যে প্রেরণ করতে সফল হয় ১২ই মে, ২০১৮ সালে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা তিন ধরনের-সড়ক ও রেল পরিবহন, নৌ-পরিবহন ও বিমান পরিবহন। অর্থনৈতিক ভাবে "পরিবহন ও যোগাযোগ" খাতের অবদান জি.ডি.পি তে ২০১৮ সালে ছিল প্রায় ১১ শতাংশ। তবে এই ১১ শতাংশ মূল্যের প্রধান অংশই এসেছিল তদুপরি গ্রামীন ফীডার রোডগুলো অর্থনৈতিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের উন্নতির চরিত্র আঞ্চলিক এবং মৌসুমী। বিমান পথ প্রধানত: বাইরের যাত্রীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়। রেল পথে দীর্ঘদিন ধরে কোন উন্নতি হয় নি। বাংলাদেশের পরিবহন খাত সামগ্রিক বিচারে প্রয়োজনের তুলনায় অবিকশিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে টেলি-যোগাযোগ বাংলাদেশে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে এ ক্ষেত্রে নানাধরনের আধুনিকায়নও ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থাকে যে তিনভাগে ভাগ করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

ক. জল পরিবহন ব্যবস্থা; খ. স্থল পরিবহন ব্যবস্থা;

গ. বিমান পরিবহন ব্যবস্থা।

২. বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে জি.ডি.পি-তে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোজিত মূল্যের আপেক্ষিক অনুপাত ছিল-

ক. ১৫ শতাংশ; খ. ১০ শতাংশ; গ. ৫ শতাংশ

৩. বাংলাদেশের বাৎসরিক পণ্য পরিবহনের এবং যাত্রী পরিবহনের অর্ধেকের বেশি অংশ পরিবাহিত হয়-

ক. নৌ পথে; খ. স্থলে পথে; গ. আকাশ পথে।

৪. বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থা প্রথম গড়ে উঠেছিল-

ক. ঔপনেবিশক আমলে; খ. ১৯৪৭ সালের পর;

গ. ১৯৭১ সালের পরে।

৫. বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক-

ক. পূর্ব-পশ্চিম মুখী; খ. উত্তর-দক্ষিন মুখী;

গ. বিভিন্ন মুখী এবং বিচিত্র।

৬. বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান দুটি দুর্বলতা হচ্ছে-

ক. মাথাপিছু সড়ক দৈর্ঘ্য কম এবং পাকা সড়কের অভাব;

খ. মাথাপিছু সড়ক দৈর্ঘ্যের অভাব এবং সড়কগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ হয় নি;

গ. সড়কের অভাব এবং সড়ক দৈর্ঘ্যের স্থবিরতা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশে ইদানিং অত্যাধুনিক যোগাযোগের কোন ক্ষেত্রগুলো প্রসার লাভ করেছে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থল-জল-আকাশ পথের পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।